সমকাল

তারিখ 06 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নতুন কৌশল জরুরি

উচ্চশিক্ষা | ড. মুহ. আমিনুল ইসলাম আকন্দ

সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। পরবর্তী দু'দশকে চালু হয়েছিল মাত্র দুটি। তবে বিগত দু'যুগে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে ৩৮-এ উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে বাজার চাহিদা থাকায় '৯০-এর দশকে চালু হয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা তিন ডিজিটে পৌঁছতে চলেছে। এ বৃদ্ধি দেশের উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণ সক্ষমতার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছিল না বলেই হয়তো এসবের অবকাঠামো ও শিক্ষক-মান সমালোচিত। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) নিজেই অভিন্ন শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালার ভূমিকা দিতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ভেদে গ্র্যাজুয়েট মানের পার্থক্যকে সামনে তুলে এনেছে। এর পরও দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই জ্ঞানচর্চা, সৃজন ও বিতরণে নেতৃত্ব নিয়ে আছে। আর গুণগত সমস্যা উত্তরণে ইউজিসি বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় দেশের ডিগ্রি প্রদানকৃত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাশুরেন্স সেল (আইকিউএসি) চালু করতে কাজ করেছে। এর মাঝে সরকারিভাবে হবিগঞ্জ কৃষি, খুলনা কৃষি, রবীন্দ্র ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় আছে চালুর অপেক্ষায়।

প্রচলিত নিয়মেই সরকারি কোনো বিশ্ববিদ্যালয় চালুর আগে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকে। পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলায় বিদেশি সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পে প্রথমেই গড়ে তোলা হয়েছিল বিশাল লাইব্রেরি ও সুসজ্জিত গবেষণাগারসহ বিস্তর অবকাঠামো সুবিধা। শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর আগেই লোকজন বুঝে নিত এর বিশালতা। কিন্তু একুশ শতকে চালু করা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নেওয়া হয়েছিল দেশীয় অর্থসংস্থানে সীমিত আকারের প্রকল্প। তার পরও এক বছরকাল বাস্তবায়নের পরই প্রকল্প পরিচালকের স্থলে উপাচার্য নিয়োগ দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এদের অবয়ব দেখে এলাকার লোকজন পর্যন্ত যেন বিশ্ববিদ্যালয় বলতে রাজি নয়। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর মায়ের মুখে বলতে শুনেছি, তার মেয়ে কলেজে গেছে। গল্পের ছলে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য বলছিলেন, স্থানীয়রা এটিকে প্রযুক্তি কলেজ বলে থাকে। তাই তিনি নামফলকে 'নোয়াখালী' ও 'বিশ্ববিদ্যালয়' শব্দ দুটি বড় করে লিখে দিয়েছিলেন। এরূপ অনেক গল্পের সংকলন করা হয়তো কঠিন হবে না। তবে বলতে কি, বিদ্যালয়ের মতো অবকাঠামো নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শুরু করা কতটা শোভনীয় ছিল? আর আগেকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামো নাজুক অবস্থায় রেখে একইভাবে নতুনগুলো চালু করা কি সমীচীন হবে?

অনেকে ছাত্রমানের পার্থক্যের কারণেই গ্র্যাজুয়েট মানের পার্থক্য হয় বলে দাবি করে থাকেন, যার যৌক্তিকতা খুবই কম। কারণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষায় স্বচ্ছতা থাকায় একেবারে মানহীনরা আসতে পারছে না। তবে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীরা বিশাল লাইব্রেরি ও অডিটোরিয়াম দূরের কথা, ভালো শ্রেণিকক্ষ ও গবেষণাগারই পাচ্ছে না। গবেষণাগার সুবিধা তৈরি না করে ফার্মাসি বা মলিকুলার বায়োলজির মতো বিষয় খুলে যত ভালো ছাত্রই ভর্তি হোক না কেন, তাদের মান কীভাবে বজায় থাকবে? এরই মধ্যে নতুন নতুন বিভাগ খোলায় অবকাঠামো ঘাটতির এক দুষ্টচক্র তৈরি হচ্ছে। কোনো রূপ প্রভাষক নিয়োগ দিয়ে পাঠক্রম চালু করায় শুরুর দিকের ব্যাচগুলো সহকারী অধ্যাপক থেকে পাঠ গ্রহণ করেই শিক্ষাজীবন শেষ করছে। আমাদের শিক্ষক নির্দেশিত পাঠদান পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তিতে শিক্ষক অভিজ্ঞতার প্রভাব তো থাকছেই। এভাবে শিক্ষক-মান, মূলধনগত সুবিধা ও পরিবেশের ভিন্নতার কারণেই নতুন ও পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট মানে ফারাক তৈরি হচ্ছে।

এককালে মুকুটহীন সম্রাট হিসেবে খ্যাত, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-মান কেমন হওয়া উচিত– এ নিয়ে অনেক বিতর্ক থাকতে পারে। তবে সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে এরই মধ্যে 'শিক্ষক আমি শ্রেষ্ঠ সবার, দিল্লিপতি সে কোন স্যার'-এর মতো কবিতার পঙক্তি তীব্রতা হারিয়েছে। আজকাল অনেকে মেধাবী বেশি আর্থিক সুবিধাপূর্ণ অন্য পেশার চেয়ে শিক্ষকতাকে পছন্দ করছে না। প্রভাষক নিয়োগ দেওয়া অনেকটা সহজ হলেও উচ্চতর পদে পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের পাওয়া যায় না। তাই তো উপাচার্য মহোদয়ের অনেককে পাঁচ-দশটি বিভাগের চেয়ারম্যানসহ অন্য প্রশাসনিক পদের দায়িত্ব পালন করতে হয়। ক্যাম্পাসের রাজা যদি উজির-নাজিরের কাজও করেন, তাহলে তিনি কীভাবে ভিশনারি হবেন? আবার উচ্চতর পদে নিয়োগ দিতে গিয়ে প্রার্থীর অভিজ্ঞতাকালে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের জ্ঞানচর্চার বিরতি মানিয়ে ওঠার মতো কি-না, তা বিবেচনা করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদনে বেসরকারি কলেজের কোনো প্রার্থীর জন্য হয়তো কলেজের প্যাড, প্রাতিষ্ঠানিক সিলমোহর ও স্বাক্ষরকারীর সিলসহ কাগজ উপস্থাপন করা কঠিন নয়। অথচ সেরা মানের কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অভিজ্ঞতা সনদ বা অনাপত্তিপত্র পেতে অনেক বেগ পেতে হয়। সরকারি রীতির কঠিন ব্যাখ্যা প্রদান করলে গুণগত মানসম্পন্ন প্রার্থীই কি বাদ যাবে না?

এত হিসাব ছাড়াই খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রি ও উঁচু মানের প্রকাশনাধারীরা উন্নত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চতর পদে অহরহ নিয়োগ পেয়ে থাকেন। আমাদের দেশেও মানসম্মত পিএইচডিধারীকে সরাসরি সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগের বিধান আছে। তবে অনেক সময় আরোপিত বিধিমালার কারণে একজন সহকারী অধ্যাপককে একই সময়ে যোগদানকারী প্রভাষকের সঙ্গে পদোন্নতি পেতে হয়। সম্প্রতি উত্তর আমেরিকার পিএইচডি ও পোস্ট-পিএইচডিধারী কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সহকারী অধ্যাপক স্বপদে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা বা ফিডার পিরিয়ড পার করে পদোন্নতি না পেয়ে বিকল্প খুঁজে পদোন্নতিসহ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পেয়েছেন। যে শিক্ষককে পাঁচ দশকের পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজন, তাকে এক দশকের নতুনটিতে রাখার প্রয়োজন কি ছিল না? যেখানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রভাষক নিয়োগে লিখিত পরীক্ষার প্রস্তাব করায় অনেক শিক্ষক একে কামলা সৃষ্টির প্রক্রিয়া বলে প্রতিক্রিয়া দেখান, সেখানে শিক্ষক-প্রাধান্য বিজ্ঞ সিন্ডিকেট নীতিমালা পরিবর্তন করত যোগ্যতরদের তাড়ানোর প্রক্রিয়া সমর্থন করলে তার সমালোচনা কি কেউ করে না? বিষয়টি আরও জটিল যখন পিএইচডিধারী সহযোগী অধ্যাপককে একই সময়ে যোগদানকারী একজন প্রভাষকের সঙ্গে অধ্যাপকে পদোন্নয়নের হিসাব কশা হয়। এভাবে বঞ্চনা আসছে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জ্ঞানচর্চা ও সৃষ্টিতে নিয়োজিতদের আবেদন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

যতদূর সম্ভব মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের ধরে রাখার জন্য শিশু বিশ্ববিদ্যালয়ে এক যুগের জন্য হলেও ফিডার পিরিয়ড়ের ভিত্তিতে পদোন্নয়নের সুরক্ষানীতি থাকা প্রয়োজন। তবে কোনো বিভাগ চালুর আগে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কাউকে নিয়োগ দেওয়া না গেলে কয়েক বছরের জন্য হলেও স্বনামধন্য কোনো অধ্যাপককে অতিরিক্ত বিশেষ প্রণোদনায় আনা বাঞ্ছনীয় হবে। তা ছাড়া শিক্ষা কার্যক্রমকে স্বাচ্ছন্দ্যে এগিয়ে নিতে শুরুর এক দশক অন্তত ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ রাখা জরুরি বলে মনে হয়।

akanda_ai@hotmail.com